ভূমিকা

INTRODUCTION

উনিশ শতক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নবজাগরণের যুগ। এইসময় পুরুষ সাহিত্যিকদের পাশাপাশি নারী সাহিত্যিকরাও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না, বেশ কিছু নারী সাহিত্যিক নিজ প্রতিভার বলে পাঠকমহলে চিরন্তন আসন লাভ করেছিলেন। বাংলাসাহিত্যে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলাসাহিত্যে লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটে। যদিও এই পথ-চলাটা শুরু হয়েছিল আরও অনেক আগে। মধ্যযুগের কবি চন্দ্রাবতীকেই বাংলায় প্রথম নারী সাহিত্যিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চন্দ্রাবতী রচিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মলুয়া, দস্যু কেনারামের কাহিনি, রামায়ণ পালা পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা।

যাই হোক নারী সাহিত্যিকদের ধারাবাহিকতায় আধুনিক যুগে আরো কিছু নাম অবধারিতভাবেই এসে যায়। যেমন হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স, রাসসুন্দরী দাসী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিণী দাসী, কামিনী রায়, কুসুমকুমারী দেবী, বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী প্রমুখ। সেই ধারাবাহিকতার পথ ধরেই বাংলাসাহিত্যে আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের মতো নারী সাহিত্যিক। যাঁরা নিজ প্রতিভার বলে ছাপ রেখে গেছেন বাংলার পাঠকমহলে।

বালা ছোটগল্পের জগতে জ্যোতির্ময়ী দেবী এক পরিচিত নাম। তবে সাহিত্যের হাটে না হোক সুধী ও বিদগ্ধ পাঠকমহলে তাঁর লেখা সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রাজস্থানের গল্পগুলি যখন বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তখন বিদগ্ধ পাঠকমহলে সেগুলি বিশেষ আগ্রহরে সঞ্চার করেছিল। বহু নামকরা সাহিত্য সমালোচকের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন তিনি। লেখিকার অসংখ্য রসোত্তীর্ণ গল্প মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সে যুগে এবং আধুনিক কালেও নানা পত্র পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প, ভ্রমণকথা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, কিছু গল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর 'রাজযোটক', 'ব্যাণ্ডমাস্টারের মা' গল্পসংগ্রহ, 'আরাবল্লীর আড়ালে রাজস্থানী হারেমের রোমাঞ্চকর উপাখ্যান এবং 'সময় ও সুকৃতির তীর্থযাত্রার বর্ণনা যারা পড়বেন তারা এই লেখিকার স্বচ্ছ নিটোল গল্পগুলির লাবণ্যে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। জ্যোতির্ময়ী দেবীর আর একটি কৃতিত্ব এই যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমাকে রাজস্থান-মথুরা-বৃন্দাবন পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। তাঁর এই সাহিত্যকর্মকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। তৎকালীন সমাজে একজন মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে তিনি নারীদের কথা যেমন দরদ দিয়ে লিখেছেন তা পাঠককে ভাবিয়ে তোলে সন্দেহ নেই। মাত্র দশ বছর বয়সে বিয়ে এবং পঁচিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে লেখিকাকে পুনরায় ফিরে আসতে হয়েছিল পিতৃগৃহ রাজস্থানে। ছয়টি সন্তানের জননী হয়েও তাঁর সাহিত্যপ্রীতি, সমাজের মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ, সেই সাথে রাজ অন্তঃপুরের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণই হল তাঁর কালজয়ী ছোটগল্পগুলির মূলধন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে ভারতীয় নারীদের দুরবস্থার ছবি। এই ক্ষেত্রে তিনি শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। জ্যোতির্ময়ী দেবী এমন একজন লেখিকা যিনি শুধুমাত্র যশ ও খ্যাতির মুখ চেয়ে তিনি কলম ধরেন নি, তাঁর সীমিত স্বীকৃতিতে কোনও ক্ষোভ ছিল বলেও মনে হয় না। জন্ম এবং শৈশবের অনেকটা সময় রাজস্থানে কাটানো এবং বিয়ের পর হুগলিতে বসবাসকালীন যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তাই ভাষারূপ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে। এই সময়টাতেই লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর

সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। লেখিকা তাঁর আত্মজীবনী 'স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ' গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন-

''আমাদের সেকালটা যে দেশে কেটেছে সেটা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলা দেশ নয়, সে দেশটা রাজস্থান। বাবলাগাছে ভরা মরুপ্রান্তর, হরিণ ময়ূরের লীলাভূমি, নদনদীহীন দূরে দূরে ধূসর নীল পাহাড়ঘেরা সে দেশ। তিনমাস প্রখর সোনা রংয়ের রৌদ্র, শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে মাসখানেক ক্ষণ বর্ষণ, বর্ষায় পাহাড়ের উপর ঘণ নীল মেঘের রঙের ময়ূরের নৃত্যলীলার উৎসব, দুর্জয় শীতে তিনমাস কুয়াশা ঘেরা ম্লান সকাল সন্ধ্যা ও সংক্ষিপ্ত দিন - নামমাত্র কদিন শরৎ হেমন্ত ও বসন্তকাল নিয়ে এই আমাদের ছেলেবেলার দেশ। কিন্তু আজও মনে হয় এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি' আর মনে হয় সে দেশ যেন মনে না বাস্তবে।''(গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫৫)

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রায় বিস্মৃত লেখিকাকে পুনরায় পাঠকদের সামনে পরিচিতি ঘটানোই হবে এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। ভারতের অন্তঃপুরের নারীদের হৃদয়বেদনা তিনি অত্যন্ত দরদী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ধনী- দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মেয়েরাই তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে। সেখানে যেমন রয়েছে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থান ঠিক তেমনি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের নারীদের কথাও সমানভাবে এসেছে। অপরদিকে তাঁর কিছু গল্পে রাজস্থানী হারেমের নারীদের অবস্থান দেখানো হয়েছে আবার পতিতালয়ের নারীদের দুর্দশার নানা ছবিও তাঁর কিছু গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। এক কথায় প্রায় গোটা ভারতের নারী চরিত্র জ্যোতির্ময়ী দেবী অনন্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই কৃতিত্বের কথা নব প্রজন্মের পাঠকদের সামনে তুলে ধরাও হবে এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

একদিকে জ্যোতির্ময়ী দেবী যেমন নারীবাদী সাহিত্যিক হিসেবে নারীদের হৃদয়বেদনার কথা তুলে ধরেছেন অনন্য দক্ষতায় ঠিক তেমনই আশালতা সিংহ। আশালতা সিংহকেও লড়াই করতে হয়েছিল তৎকালীন সমাজ-পরিবেশের সাথে। তাঁর সাহিত্যকর্মে পরিবারও পাশে ছিল না। অতি রক্ষণশীল পরিবারে মাত্র তের বছর বয়সে আশালতার বিবাহ হয়। পিতৃগৃহে উদার মুক্তমনা পরিবেশ পেলেও শ্বশুরবাড়ি ছিল আগাগোড়া রক্ষণশীল, এমনকি তাঁর স্বামীও সাহিত্যকর্মে তাঁকে সহায়তা করেননি। তিনিও একান্তে বসে অতি দরদ দিয়ে লিখে গেছেন অন্তঃপুরীকাদের হৃদয়বেদনার ছবি। তবে আশালতা দেবী মেয়েদের জীবনের দুঃখ-বেদনা বর্ণনার পাশাপাশি তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধেও কলম ধরেছেন।

আশালতা দেবী নিজের ব্যক্তিগত জীবনে নারী পুরুষের বৈষম্যের শিকার হননি, কিন্তু সমাজের মানুষের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। তাঁর গল্পগুলিতে বারংবার এসেছে নারীর আত্মানুসন্ধান, এসেছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। সে লড়াই কখনো পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে, কখনো ব্যক্তি পুরুষের বিরুদ্ধে, আবার কখনো বা সেইসব নারীর বিরুদ্ধে যারা কিনা পুরুষের অত্যাচারের হাতকে শক্ত হতে সাহায্য করে। এসবের মধ্য দিয়েই নারীর সামাজিক অবস্থানকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন আশালতা দেবী। আমাদের মনের কোণে ছাপ রেখে যায় লেখিকার দ্বারা নির্দিষ্ট নারীর সামাজিক অবস্থানটি, যা আমাদের মনে স্পন্দন জাগায়। আশালতার গল্পগুলি পড়তে গিয়ে মনে হয় বাংলাদেশের নারী আজও কতটা অসহায়। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী যে কেবল সন্তান ও ঘর সামলাবার কারিগর তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। পণপ্রথা, কনে দেখা, নারীদের অশিক্ষা, বঞ্চনা তাঁকে বেদনা দিয়েছিল প্রচুর। বিবাহের বাজারে নারী যে কোনো পণ্য নয় সে কথা সোচ্চারকণ্ঠে বলেছেন লেখিকা আশালতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ 'ভালো মেয়ে' বা 'ভালো গৃহবধূ' হওয়ার

সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিটি মেয়ের নারীসুলভ আচরণ অর্থাৎ ধীরতা, সহনশীলতা, ত্যাগ, নমনীয়তা, এই গুণগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ পুরুষদের ভাবনায় লালিত হবে তাদের চিন্তাধারা, পুরুষদের মনের মতো হয়ে উঠতে হবে তাদের। অথচ পুরুষদের মতো থাকবে না তাদের স্বতন্ত্র জগৎ। আশালতা সিংহের গল্পের নারীচরিত্রগুলি সমাজের এই আদলে গড়া নয়। লজ্জা, ভীরুতা, অসহায়তার বদলে তাদের চরিত্রে প্রকাশ পায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা, প্রতিবাদী মানসিকতা, স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা, সাহসিকতা, পুরুষের সমকক্ষ হওয়ায় ব্যক্তিত্ব। নারী-পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্যকে আশালতা সিংহ ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্য ভাষায়। নারীর প্রথম পরিচয় হল সে মানুষ, তা লেখিকা উপলব্ধি করতেন বলেই তিনি অধিকাংশ গল্পে নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন।

বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য হল জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের ছোটগল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান দেখানো। একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে এখনকার নারীরা অনেক বেশি স্বাধীনতা, মর্যাদা, এবং সুখ সুবিধা ভোগ করে থাকে। তবুও পুরোপুরি স্বাধীনতা বা মর্যাদা পেতে নারীকে আরো অনেক বেশি লড়াই করতে হবে। তাই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লড়াই, পুরুষ-শাসিত সমাজে নিজের আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে নিরলসভাবে খেটে যাওয়া নারীদের কথা আমাদের নব প্রজন্মের পাঠকদের সামনে অনেক অজানা কাহিনি নতুন করে ধরা পড়বে বলেই মনে হয়। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে এই দুই লেখিকা যে সময়ে সাহিত্য অঙ্গনে পদার্পণ করেন তখন বিশ্বসাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যে মানবী বিদ্যা চর্চার প্রথাগত কোনো পদ্ধতি শুরু হয়নি। তবুও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এই দুই লেখিকা যে সব ছোটোগল্প লিখে গেছেন তা আজকের মানবী বিদ্যাচর্চার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

সমস্যা নিরূপণ /STATEMENT OF THE PROBLEM ঃ—

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে মহিলা লেখকদের পদার্পণ ঘটেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং আশালতা সিংহ এমন দুজন লেখিকা যাঁরা বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও উভয়ের জন্মভূমি এবং কর্মজীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন বাংলার বাইরে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ক্ষেত্রে সুদূর রাজস্থানের জয়পুর এবং আশালতা সিংহের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী বিহারের ভাগলপুর। দুজনেই সাহিত্যের বিবিধ প্রকরণগুলি স্পর্শ করলেও ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে উভয়ই এক ঈর্ষনীয় উচ্চতা স্পর্শ করেছিলেন। সেই প্রকরণের মাধ্যমে তাঁরা সমাজের বিভিন্ন অংশকে দেখতে চেয়েছেন যার মধ্যে একটা বৃহত অংশ জুড়ে রয়েছে নারীর সামাজিক অবস্থান অন্বেষণ। মূল বিষয় নারীর সামাজিক অবস্থান অন্বেষণ হলেও তার মধ্যে রয়ে গেছে বিবিধ স্তর বিন্যাস। উচ্চবিত্ত সমাজে নারীর অবস্থান এবং নিম্নবিত্ত সমাজে নারীর অবস্থান এক নয়। অনেক সময় নারী ভুগতে থাকে এক অস্তিত্বের সংকটে। কী তার সঠিক পরিচয় এই প্রশ্নটার সমাধান করে উঠতে পারে না সমগ্র জীবন জুড়ে। প্রগতিশীলতা অনেক সময় এক ব্যাধি রূপে দেখা দিতে পারে নারীর জীবনে। যে সব পদক্ষেপকে সে মনে করছে আপাত অগ্রসরণ সেই পদক্ষেপই পশ্চাদানুসারিতার চিহ্নবহ হয়ে ওঠে। অনেক সময় নারীই হয়ে ওঠে পার্শ্ববর্তী নারীর শত্রু। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা দেশভাগের মতো সমস্যায় নারী জীবনে ঘনিয়ে আসে নারকীয় পরিস্থিতি। এই সকল সমস্যার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন উভয় লেখিকা তাঁদের রচিত ছোটোগল্পের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। তাছাড়া এসেছে লিঙ্গ বৈষম্য, নারীর শিক্ষা, বিবাহ, পণপ্রথা, বৈধব্য ইত্যাদি বিষয়। আমাদের অন্বেষণ সেই সমস্যাগুলির স্বরূপ নির্ণয়।

সমস্যা অনুসন্ধান/ PROBLEM TO BE INVESTIGATED ঃ—

সমস্যা অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসাবে আমরা বেছে নিয়েছি বাংলা সাহিত্যের দুই স্বনামধন্য লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং আশালতা সিংহের ছোটোগল্পের বিস্তৃত পরিসরে। দুই লেখিকা রচিত ছোটোগল্পের সংখ্যা দুই শতাধিক। সেখানে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছি নারীর সামাজিক অবস্থান। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজে নারীর অবস্থানের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না? পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থান কি — এই প্রশ্নগুলি বারংবার ঘুরপাক খায় উভয় লেখিকার ছোটোগল্পের অলিন্দে। পরিবারে একটি সন্তান জন্মলাভের পর শিশুটি পুরুষ না কি নারী এই লিঙ্গ পরিচয়ের উপর নির্ভর করে বদলে যায় উভয়ের বড় হওয়ার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি। আশালতা সিংহ তাঁর 'নারীর মূল্য' গল্পে বলেছেন — ''বাঙালী ঘরে ছেলেতে মেয়েতে এতই পার্থক্য! আকাশ পাতাল ব্যবধান। ছেলে হইলে সবারই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, ঘন ঘন শাঁখ বাজিবে। আর মেয়ে যদি দৈবক্রমে জন্মাইল, জননী নিজেকে মনে করিবেন অপরাধী। পরিজনের কাছে তাঁহার মাথা হেট হইবে। নবজাতা অতিথিটির জন্য মানব সংসারে কোথাও কোন অভ্যর্থনা কোন সম্মানের আয়োজন হইবে না।'' পরবর্তী জীবনে সেই মেয়েটিকে পাত্রস্থ করার লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের প্রাণপাত, পণপ্রথা, বিবাহের সময় পাত্রী পক্ষকে অহেতু পাত্রপক্ষের অবমাননা ইত্যাদি সবই ফুটে উঠেছে লেখিকাদের কলমে। বিবাহ পরবর্তী জীবনে সংসারে আপাত শান্তি রক্ষার নামে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া এড়ায় নি লেখিকাদের দৃষ্টি। এতো নারী জীবনের এক গড্ডলিকা যাত্রা। এর বাইরে আছে পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের শোষণের অস্ত্র হিসাবে নারীর পার্শ্ববর্তী নারীকে শোষণের মর্মন্তুদ আখ্যান। তার সঙ্গে প্রগতিশীলতার নামে নারীর ছিন্নমস্তা রূপ। এর বাইরে জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পে স্থান পেয়েছে বহির্বঙ্গে নারীদের সামাজিক অবস্থান। জন্মসূত্রে জয়পুরবাসী হওয়ার জন্য রাজঅন্তঃপুরের বিচিত্র আখ্যান জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পে বাণীরূপ লাভ করেছে। পতিতাপল্লীর নারীদের জীবনযন্ত্রণাও ছায়া ফেলে গেছে তাঁর গল্পগুলিতে। বাংলা ভাষায় তিনি একখন্ড রাজস্থান-পাঞ্জাবকে উপহার দিয়েছেন বাঙালি পাঠককে। এ আমাদের এক বাড়তি পাওনা। সর্বোপরি দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে নারীমেধের বিচিত্র আখ্যান গল্পগুলিতে বাণী রূপ লাভ করেছে। বাংলায় দেশভাগ কেন্দ্রিক গল্পের সংখ্যা সত্যিই কম। সেখানে দাঁড়িয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। তাঁর একাধিক গল্পে আমরা দেশভাগের প্রেক্ষিতে বিপর্যস্ত নারী জীবনের সন্ধান পাই।

গবেষণার লক্ষ্য/ OBJECT OF THE RESEARCH ঃ—

''জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থান'' শীর্ষক সম্ভাব্য গবেষণা পত্রের লক্ষ্য হিসাবে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসন্ধান করব —

১। সমাজে প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্য

২। নারী শিক্ষা

৩। পণপ্রথা

৪। বৈধব্য

৫। নারীর অস্তিত্বের সংকট

৬। পুরুষ শাসিত সমাজে শোষণের অস্ত্র রূপে নারীর ব্যবহার

৭। উগ্র আধুনিকতা

৮। রাজ অন্তঃপুরের নারীদের সমস্যা

৯। পতিতাপল্লীর নারীদের সংকট

১০। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বিপর্যস্ত নারীর জীবন

১১। বহির্বঙ্গের নারীদের সমস্যা।

পূর্ব-অনুমান / HYPOTHESIS ঃ—

উপরোক্ত সমস্যাগুলি উভয় লেখিকার ছোটোগল্পেই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা দিয়েছে। নারীর অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে এই সমস্যাগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং আশালতা সিংহ যখন সাহিত্য প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেন তখন মানবী বিদ্যা (Women studyes) সংক্রান্ত ধারণা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু দুজনেই নারী হওয়ার সুবাদে এক সংবেদনশীল দৃষ্টি নিয়ে পারিপার্শ্বকে দেখেছেন। তাই মানবী বিদ্যা (Women studyes) সংক্রান্ত কোনো ধারণা না থাকলেও উভয়ের ছোটোগল্পে সেই বিষয়গুলির ছায়াপাত ঘটেছে। উপরোক্ত প্রতিটি সমস্যাই তাঁদের ছোটোগল্পে দেখা দিয়েছে। কোনো সমাধানের আরোপিত চেষ্টা তাঁরা করেন নি। সবটাই ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকের বিচারের উপর।

গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি /RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY ঃ—

জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়টিকে সামনে রেখে আমরা আমাদের সমগ্র গবেষণা প্রকল্পটিকে নিম্নলিখিত অধ্যায় সমূহে বিন্যস্ত করতে চাই ——

১। ভূমিকা

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কথাসাহিত্যিক

৩। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা

৪। জ্যোতির্ময়ী দেবী ঃ জীবন ও সাহিত্য

৫। আশালতা সিংহ ঃ জীবন ও সাহিত্য

৬। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটোগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থান

৭। আশালতা সিংহের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থান

৮। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটোগল্প ও আশালতা সিংহের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থানের তুলনা

৯। উপসংহার

এই সমগ্র গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমরা Data analysis অর্থাৎ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে চাই। প্রাথমিক ভাবে আমরা আকরগ্রন্থ/Core Book স্বরূপ জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের ছোটোগল্পগুলিতে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ তথ্য সংগ্রহ করতে চাই তারপর সেই তথ্যগুলিকে যথাযথ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই।

তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুসঙ্গ/TOOLS TO BE USED IN THE COLLECTION OF DATA & ANALYSIS ঃ—

সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত গ্রন্থাগার/Library -র উপর নির্ভরশীল। সেখান থেকে বইগুলি সংগ্রহ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে চাই। তাছাড়া Internet-এর সাহায্যও অবশ্যম্ভাবী। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পর যে সংরূপটি প্রস্তুত হবে তা Computer-এর সাহায্যে করা হবে এবং বাঁধাই কার্য সুসম্পন্ন হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে।

সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব /SIGNIFICANCE OF THE PROPOSED WORK ঃ—

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ। স্বীয় গুণে উভয় সাহিত্যিকই সমসাময়িক কিংবদন্তীদের স্নেহ সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা যখন সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তখন মানবী বিদ্যা চর্চা (Women Studyes)র প্রচলন ছিল না। কিন্তু একজন নারী হয়ে পারিপার্শ্বের নারীদের তাঁরা যেভাবে দেখেছেন তা মানবী বিদ্যা চর্চা (Women Studyes)র অনুরূপ। সমাজে শিশুর জন্মের পর তার বড় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে লিঙ্গগত বৈসম্য তা উভয় লেখিকাকেই ভাবিয়েছে। সেই ভাবনাই সাহিত্যে বাণীমূর্তি লাভ করেছে। তাছাড়া সম্বন্ধ দেখা, পণপ্রথা, সংসারে শান্তি রাখার প্রয়োজনে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন এই সব কিছুই তাঁদের ছোটোগল্পে স্থান পেয়েছে। অনেক সময় আত্মসর্বস্ব প্রগতিশীলতাকে ভর করে নারী যে ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে তাও লেখিকাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। আবার কখনো কখনো নারীই হয়ে উঠেছে পার্শ্ববর্তী অন্য নারীর শত্রু। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রাক্কালে সমাজ যে মেতে ওঠে নারীমেধ যজ্ঞে তারও জীবন্ত দলিল উভয় লেখিকার জন্য। এসেছে হারেমের অন্তরীণ নারী কিংবা পতিতা পল্লীর নারীদের জীবন যন্ত্রণার মর্মন্তুদ আখ্যান। এই সমস্যাগুলি থেকে আজও আমাদের সমাজ মুক্তি পায় নি। তাই এই গল্পগুলির গুরুত্ব আজ শেষ হয়ে যায় নি। এইখানেই নিহিত থেকে যায় ‘‘জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থান অন্বেষণ’’ শীর্ষক সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব।

বর্তমান জ্ঞানভান্ডারের উপযোগিতা/CONTRIBUTION OF THE EXISTING KNOWLEDGE:

বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মহিলা কথাসাহিত্যিকদের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল আজও তা সমান ভাবে অব্যাহত। এই জয়যাত্রার অন্যতম উল্লেখযোগ্য শরিক হলেন — জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহ। তাঁদের সম্পর্কে বিবিধ তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা যে সকল গ্রন্থের সহায়তা লাভ করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

(১) **বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসে ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি. (কলকাতা)** এই বইটিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কথা সাহিত্যের সূচনা থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বের তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা রয়েছে। স্বভাবতই মহিলা সাহিত্যিকদের অবদানও আলোচিত হয়েছে।

(২) **বঙ্গসাহিত্যে নারী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয় (কলকাতা)**
সমগ্র বঙ্গসাহিত্য ব্যাপী মহিলা সাহিত্যিকদের অবদান এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

(৩) **বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয় (কলকাতা)**
ছয়টি খন্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থ বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনায় সমৃদ্ধ হলেও ছোটোগল্পের আলোচনাও ব্রাত্য নয়।

(৪) **বিহারে বাংলা সাহিত্য, নন্দদুলাল রায়, বিহার বাংলা একাডেমি (পাটনা)**
বিহারের বাংলা সাহিত্যিকদের সৃজন কর্ম ও সাহিত্যিক অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় ঋদ্ধ এই গ্রন্থ। আশালতা সিংহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্য এই গ্রন্থের স্থায়ী সম্পদ।

(৫) **আশালতা সিংহ রচনাবলী, বিহার বাংলা একাডেমি (পাটনা)**
এই গ্রন্থটিই সর্বপ্রথম আশালতা সিংহ সম্পর্কে আলোচনা করে। বহুল তথ্যে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থ।

(৬) **আশালতা সিংহের গল্প সংকলন (১ এবং ২), দে'জ পাবলিশিং (কলকাতা)**
আশালতা সিংহের ছোটোগল্পের পূর্ণ সংকলন এই গ্রন্থ দুটি। সঙ্গে রয়েছে তপোব্রত ঘোষের মত প্রাজ্ঞ সমালোচকের সমৃদ্ধ ভূমিকা।

(৭) **আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক: আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ, সম্পা সিন্‌হা, আশাদীপ প্রকাশনী, (কলকাতা)**
আশালতা সিংহের জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত ও সাহিত্য বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের সম্পদ।

(৮) **ব্যতিক্রমী সাহিত্য প্রতিভা ঃ আশালতা সিংহ, যোধন প্রকাশনী (রূপনারায়ণপুর)**
বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ। আশালতা সিংহের সৃজনশীলতাকে বিশ্লেষণে সহায়ক।

(৯) **জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংগ্রহ (১-৫ খন্ড) দে'জ পাবলিশিং, (কলকাতা)**
জ্যোতির্ময়ী দেবীর সমগ্র সৃজনশীলতাকে ধারণ করে রেখেছে এই গ্রন্থ, সঙ্গে রয়েছে বিদগ্ধ জনের সমৃদ্ধ ভূমিকা।

(১০) **মৌ চক্রবর্তী, সোনা নয় রূপা নয় (জ্যোতির্ময়ী দেবী : সৃষ্টি ও মূল্যায়ন), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা**
জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনায় ঋদ্ধ এই গ্রন্থ।

(১১) **অনামিকা চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময়ী দেবী জীবন ও সাহিত্যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা**
গ্রন্থটি জ্যোতির্ময়ী দেবীর জীবন ও সাহিত্যের আলোচনায় সমৃদ্ধ।

ভবিষ্যত সম্ভাবনা /FUTURE WORK :

জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের উপর গবেষণার পরিমাণ বেশ কম। দুইজনেই শতাধিক ছোটোগল্পের জন্মদাত্রী। একসময় এই গল্পগুলি সুধী পাঠক সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান কালে তাঁরা কিছুটা বিস্মৃত। আমাদের প্রয়াস নতুনভাবে মানবী বিদ্যা চর্চা (Women Studyes)র নিরীখে উভয়ের ছোটোগল্পের বিশ্লেষণ। তবে তাঁদের সৃজন প্রতিভার যা ব্যাপ্তি তাতে তাঁদের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বহুবিধ গবেষণার সম্ভাবনা উন্মোচিত রয়েছে। উভয়ের গল্পে প্রান্তিক মানুষ কিভাবে স্থান করে নিয়েছে তা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হতেই পারে। তাছাড়া সমকালীন বিক্ষুব্ধ সময় ও সমাজ কিভাবে স্থান করে নিয়েছে উভয়ের সৃজনে তাও আলোচনার বিষয় হতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মহিলা কথাসাহিত্যিক

UNBINSHA SHATABDIR BANGLA SAHITYE MAHILA KATHASAHITWIK

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাসাহিত্যে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে, যাদের লেখায় নারীবাদী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীকে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই শতাব্দীতে নারীদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালের নারী সমাজের সমস্যা, অধিকার ও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করার লক্ষ্যে সমাজে প্রনোদনা সৃষ্টি হয়েছে। এরই পরিপূরক হিসবে রাসসুন্দরী দাসী, হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স, স্বর্ণকুমারী দেবী, বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরূপমা দেবী প্রমুখ মহিলা সাহিত্যিকের সাহিত্য বিশ্লেষণ হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অবরোধ, কুসংস্কার ও শিক্ষার অভাবের কারণে যুগ যুগ ধরে বাঙালি নারী সমাজে সন্তানের জন্ম ও তার লালন-পালন, পতিসেবা ও গৃহসেবার মধ্যেই গন্ডীবদ্ধ হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের আইন, সামাজিক বিধিনিষেধ, ধর্মীয় বিবেচনা ও অর্থনৈতিক কারণে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয় তারা। এছাড়া বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দাসপ্রথা, ও সতীত্ব-ধারণার কবলে থাকার ফলে নারীর শৃঙ্খল আরও বেশি জোরালো হয়ে থাকে। আঠারো শতক পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এর ফলে নারী তার আত্মশক্তি খুঁজে পেতে থাকে। নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও বিকাশ উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেখা যায়। এই সময় থেকে নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি গুরুত্ব পেতে থাকে। উনিশ শতক বাঙালি নারী জাগরণের যুগ। সামাজিক অত্যাচার, বিধিনিষেধ প্রথা, যা নারীকে সীমায়িত করে রাখার শৃঙ্খল হিসেবে বিবেচিত হতো, সেসব শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য এই সময় সমাজে ব্যাপক আলোচনা, উদ্যোগ ও আন্দোলন শুরু হয়। এর ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। অন্যদিকে নারী তার নতুন জীবনবোধ নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও শক্তি অর্জন করে। আধুনিক চেতনা ও নানা সংস্কার নিয়ে সমাজে মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্র রচনার প্রয়াস উনিশ শতকে জোরালো হতে থাকে।

বাংলাসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকে দেখা যায় গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী ইত্যাদি রচনার বিপুল প্রয়াস। পুরুষ লেখকদের পাশাপাশি মহিলা লেখকরাও এই সময় নিজেদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটান। এর আগে বাংলাসাহিত্য ছিল প্রথাগত ও পুনরাবৃত্তি-প্রবণ। উনিশ শতকে এসে বাঙালি নারী কেবল শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারেই এগিয়ে আসেনি, শিক্ষা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নারী লেখক হয়ে ওঠার শক্তি অর্জন করতে শিখেছে। এর আগে নিজেদের নামে লেখা ছাপানোর বিষয় ছিল সংকোচ-বিহ্বলতায় অনুচ্চকিত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী রচনাকার রাসসুন্দরী দাস (১৮০৯ - ১৯০০)। তাঁর গ্রন্থের নাম ‘আমার জীবন’। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর গ্রন্থ পরিচয় লিখে দিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। ‘আমার জীবন’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। অতি শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যান। তবে মা এবং অন্যান্য পরিজনদের কাছে যথেষ্ট স্নেহেই মানুষ হয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন প্রথা মতো মাত্র ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয় তাঁর। একে একে ১২টি সন্তানের জননী হন তিনি। তখনকার দিনে

নারীকে যে কীরকম অবহেলা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হতো তা 'আমার জীবন' পড়লে জানা যায়। নারী হিসেবে এই সমাজে জন্মে যে বিড়ম্বনা তা প্রতি মুহূর্তে রাসসুন্দরী উপলব্ধি করেছেন। ব্যক্তি হিসেবে, নারী হিসেবে বঞ্চনার দিকগুলো তিনি সুচিহ্নিত করেছেন। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য সামলেও তিনি অবিচলিত ছিলেন লেখালেখির কাজে। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অধিকার রক্ষার বিষয়টি তিনি জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। বাংলা ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে মেয়েদের সেসময়কার জীবনধারার একটি দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। এমন অনেকের রচনা হয়তো মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি।

এই সময় বেশকিছু পত্রপত্রিকা নারীদের লেখা প্রকাশ করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'বামাবোধিনী' (১৮৬৭), 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯), 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭৫), 'ভারতী' (১৮৭৭) ইত্যাদি পত্রিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

একজন বিদেশিনী মহিলা কথাসাহিত্যিক হিসেবে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলন্সকে অনেকেই বাংলা উপন্যাসের পথিকৃতের মর্যাদা দিয়ে থাকেন তাঁর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) রচনার জন্য। এই প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন —

"১৮৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতি হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স কর্তৃক রচিত 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' নামক গ্রন্থটি কালের দিক দিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর অগ্রবর্তী। এই কালগত অগ্রাধিকারের বলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের গৌরব ইহারই প্রাপ্য হইতেছে।"[১]

আবার অনেকের মতে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক শিবসুন্দরী দেবী। তাঁর 'তারাবতী' উপন্যাসটি ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর বহু নারী লেখক সৃজনশীলতায় নিজেদের যুক্ত করেছেন, বাংলাসাহিত্যকে নিয়ে গেছেন অন্য উচ্চতায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দশম সন্তান ও চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮২৮ - ১৯৩২) উনিশ শতকের শেষ পর্বে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যিকের কলম হাতে তুলে নিয়ে চেয়ে দেখেছিলেন সেকালীন বাঙালি মেয়ের আলোহীন, অধিকারহীন, সহায়হীন, মূঢ়, ম্লান মুখ। বাল্যবিবাহ - বহুবিবাহ- বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে পুরুষ সমাজের তুমুল আন্দোলন অনুভব করেছিলেন। রক্ষণশীলতার, দীর্ঘলালিত সংস্কারের, প্রথাবদ্ধতার প্রতাপ - তাঁর নিয়ত-জাগ্রত মননের প্রতিক্রিয়া ধরা দিয়েছিল তাঁর প্রবন্ধমালায়, তাঁর সচেতন মানসের স্বাক্ষর রূপ নিয়েছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসে। সাল তারিখের হিসেব বলে স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস রচনার আগেই বাংলায় কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছিল। বাংলার নারী-ঔপন্যাসিকদের সারণীতে প্রথমার গৌরব স্বর্ণকুমারী দেবীরই প্রাপ্য। তাঁর মতো এমন বিচিত্র লেখা সমকালে আর কোনো নারী সাহিত্যিকের যেমন ছিলনা, তেমনি ছিলনা তাঁর মতো ধারাবাহিকতার যোগ্যতা।

"বাংলার নারী-ঔপন্যাসিকদের প্রবহমানতার গঙ্গাধারায় তিনিই প্রথম ভগীরথ-প্রথম পুরোগামিনী পথিকৃৎ।"[২]

মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে এর পরই যে নামটি অবধারিতভাবে এসে পড়ে তিনি হলেন বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)। তাঁর জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক বিখ্যাত বনেদী পরিবারে। তৎকালীন মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে গিয়ে বাড়িতে বসে তিনি বাংলা ও ইংরেজি শিখেছিলেন। রোকেয়ার মনে সদা-সর্বদা একটি প্রশ্ন জাগত যে, পুরুষের মতো নারীরও কেন স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা, জীবনযাপন করতে পারবে না? তাদের কেন সবসময় পর্দা মেনে চলতে হবে? প্রথম জীবনে

দাদা ইব্রাহিম এবং বিয়ের পর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন তাঁর পড়াশোনায় উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের মুক্তির দূত হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালে। সমস্ত রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ভেঙে মুসলিম নারীদের প্রগতির কথা সোচ্চারকণ্ঠে বলে গিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের মুসলিম নারী-প্রগতির ইতিহাস চিরস্মর ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি। মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার্থে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যা 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লসস্কুল' নামে পরিচিত। বর্তমান সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল কলকাতার একটি নামী স্কুল। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল, 'পদ্মরাগ', 'সুলতানার স্বপ্ন', 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি। 'অবরোধবাসিনী'তে তিনি এক জায়গায় বলেছেন–

''এক বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাত বাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুন নিভাইতেছে। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নীচে গিয়া বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না, ধন্য! কুল-কামিনীর -অবরোধ।''[৩]

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে মহিলা -ঔপনাসিকরূপে অসাধারণ খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারিনী হয়েছিলেন অনুরূপাদেবী (১৮৮২-১৯৫৮)। এমনকি একসময় তিনি সাহিত্য সম্রাজ্ঞী রূপেও পরিচিত ছিলেন। রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন অনুরূপা পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ সবিস্তারে অনেক কয়টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'রাণীদেবী' ছদ্মনামে কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেছি। অনরূপা ছোট গল্প রচনায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ না করলেও তাঁর রচনার সংখ্যা কম নয়। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে, 'চিত্রদীপ, 'উল্কা', 'রাঙাশাখা', 'মধুমল্লী', 'ক্রোঞ্চমিথুনের মিলনকথা' প্রভৃতি।

অনুরূপার সমসাময়িক আর একজন শক্তিমতী মহিলা কথাসাহিত্যিক হলেন নিরূপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১)। নিরূপমা দেবীর উপন্যাস ও ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প, তাদের মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যও কম, কিন্তু সব কটিই কলা-কৌশলে বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রেমের বিরোধ ও দাম্পত্য, জীবনের সংঘর্ষ প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেরই বিষয়। তবে এই বিষয়গুলি তিনি আমাদের সাধারণ, বৈচিত্রহীন গার্হস্থ্য-জীবন থেকেই আহরণ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

''তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, সুকুমার চিন্তাশীলতা ও জীবন-সমালোচনার অন্তর্নিহিত একটা কোমল-করুণ ভাব তাঁর নারী-হাতের লঘু স্পর্শটি চিনাইয়া দেয়।''[৪]

নারী সাহিত্যিকদের পথচলা শুরু হয়েছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে আর সেই পথেই বাংলা মহিলা সাহিত্যিকদের ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ক্যাথারিন ম্যুলেন্স, স্বর্ণকুমারী দেবী, বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী ও নিরূপমা দেবীর মতো নারী সাহিত্যিকেরা। এঁদের দেখানো পথ ধরেই পরবর্তীকালে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের মতো মহিলা কথাসাহিত্যিক।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা -শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৮-১৯, পৃষ্ঠা-১৬

২. সুদক্ষিনা ঘোষ, ভূমিকা, 'কাহাকে'-স্বর্ণকুমারী দেবী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১৭, পৃষ্ঠা-৮

৩. অবরোধ বাসিনী - বেগম রোকেয়া, প্রকাশক - বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, পি.ডি.এফ ফরম্যাট, পৃষ্ঠা- ৮

৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৮-১৯, পৃষ্ঠা-১৬০

নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা

NARIBADI SAHITYA SAMALOCHANA

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাসাহিত্যে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। সাহিত্যিকদের যদিও মহিলা সাহিত্যিক কিংবা পুরুষ সাহিত্যিক এইভাবে ব্যাখ্যায়িত করা যায় না। মেয়েদের সংগ্রামের কতটা যে অন্তঃপুরের মধ্যে হারিয়ে যেতে বসে, সে সম্পর্কে এখন সারা পৃথিবী জুড়ে নারী আন্দোলন আমাদের অনেকটাই সজাগ করে দিয়েছে। গত তিরিশ বছরে সাহিত্য-সমালোচনায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপ্রবেশের ফলে মেয়েদের লেখার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়েছে সন্দেহ নেই। 'মহিলা লেখক' বলে একটি লেবেল দিয়ে মেয়েদের লেখাকে এতদিন ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। এটি অবশ্য সমাজে পুরুষ প্রাধান্যেরই প্রতিফলন। বিখ্যাত নারীবাদী লেখক সিমন দ্য বোভেয়ার-এর মতে, ''নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, সমাজ নারী সৃষ্টি করে। অর্থাৎ জন্মগত সূত্রে কেউ নারী হয়না, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্ম, রীতিনীতির সাহায্যে কন্যাসন্তানকে নারী করে তোলে। নারী পুরুষগত পার্থক্য আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গড়া।''[১]

যাই হোক একথা বলতে দ্বিধা নেই পুরুষের চোখে একজন নারী যেভাবে ধরা দেয় একজন নারীর দৃষ্টিতে নারীকে আরও ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। অবশ্য একথাও সত্য যে সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানদন্ড স্ত্রী-পুরুষ নিরপেক্ষভাবে হওয়া উচিত। পুরুষ ও নারীর রচিত সাহিত্য-বিচারের কোনো আদর্শ নেই। চরিত্র-বিশ্লেষণ ও জীবন-সমস্যার গভীরতা-প্রতিপাদন করাই সমস্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্যেরই সাধারণধর্ম। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে —
''আমাদের বাংলাসাহিত্যের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্যেরও প্রথম যুগে নারীর বাণী মূক ও নীরব ছিল — পুরুষের ইচ্ছার অনুবর্তন বা প্রতিরোধই তাহার একমাত্র কার্য ছিল।''[২]

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। সেই তরঙ্গের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে আমাদের বাংলা সাহিত্যেও। বাংলাসাহিত্য এখন অনেক বেশি স্বাবলম্বী। তাই বাংলাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন বেশ কিছু শক্তিমতী মহিলা সাহিত্যিক, যাদের রচনার গুণে বাঙালি নারী নিজেদের চিনতে শিখল নতুন করে, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য, পুরুষের সমমর্যাদা লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল তারা। নারীরা আজকে আর ঘরে বসে নেই, তারা মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, পাইলট হিসাবে বিমান চালাচ্ছে কিংবা সেনাবাহিনী ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছে। বাংলাদেশের নারীদের জীবন-যন্ত্রণার ছবি অঙ্কন করেছেন মহিলা সাহিত্যিকরা। এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় কথাসাহিত্যিকদের সাথে তাদের রচনাভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য থাকবেই। এই বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেছেন—

''বঙ্গসাহিত্যে মহিলা-রচিত উপন্যাসের বিচার করিতেৰ এই দুটি মূলসূত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রথমত, তাহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ কতখানি ও দ্বিতীয়ত, তাহাদের মধ্যে নারীর সুর-বৈশিষ্ট্যের কতখানি পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য বাংলা উপন্যাসে নারী-বৈশিষ্ট্য ঠিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত অভিন্ন নহে। সামাজিক রীতিনীতি ও অবস্থা-বৈষম্যের জন্য উভয়ক্ষেত্রে সুরেরও পার্থক্য হইবে।''[৩]

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যও এই পথে পিছিয়ে নেই। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বহু সাহিত্যিকের রচনা আজ এই আঙ্গিকে পুনরায় আলোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায়, আশালতা সিংহের ছোটগল্পে নারীবাদী ভাবনা, ব্যতিক্রমী সাহিত্য প্রতিভা : আশালতা সিংহ, সম্পাদনা : জয়ন্তী সাহা, কৌশিক দাশগুপ্ত ও তিস্তা দত্তরায়, যোধন প্রকাশনী, বর্ধমান, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১২৮

২. বঙ্গাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৮-১৯, পৃষ্ঠা - ১৫৩

৩. ঐ , পৃষ্ঠা - ১৫৪

জ্যোতির্ময়ী দেবীর জীবন ও সাহিত্য

JYOTIRMOYEE DEVIR JIBAN O SAHITYA

জোতির্ময়ী দেবী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি রাজস্থানের জয়পুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র সেন ছিলেন জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান। পিতামহ সংসারচন্দ্র জয়পুরে সামন্ত-রাজার সর্বোচ্চ প্রশাসনের পদে আসীন ছিলেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় ও রাজস্থানী ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে ঘটেছিল তাঁর পিতৃ-পরিবারে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনের প্রসারে সহায়তা করেছিল এই পরিবেশ। বিবাহ হয়েছিল হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার সচ্ছল, অভিজাত ও সংস্কৃতি-মনস্ক এক পরিবারে। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ছেদ পড়ে তাঁর সংসারজীবনে। পাটনায় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় ফিরে আসেন জয়পুরে। সৃষ্টির তাগিদে নবতর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন রাজস্থান ও তার জনজীবনকে। এই প্রবাসী লেখিকার একের পর এক রচনা ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রচনা সাড়া ফেলেছিল পাঠক ও লেখকমহলে। শুধুমাত্র পত্রযোগেই তিনি বহুকাল পরিচিত ছিলেন সম্পাদক-মহলে। প্রথম যখন প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখিকার সাক্ষাৎ হয়, রামানন্দবাবু তাঁকে বলেছিলেন—

‘‘আপনার লেখা চিনি কিন্তু আমরা তো লেখকদের চিনি না।’’[১]

কথাটি তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল এই কারণেই যে প্রবাসী থেকে কখনো ফেরৎ আসেনি তাঁর লেখা। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতাতে তিনি অনায়াসে বিচরণ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

‘‘তাঁর তীর্থ পরিক্রমা ও গল্পগুলিতে সারা ভারতের দেশ ও কাল ছায়া ফেলেছে। বিভিন্ন প্রদেশের জীবন ও সমাজ – বিশেষত স্ত্রী সমাজের কাহিনী তাঁর বর্ণনার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।’’[২]

আত্মপ্রচার-বিমুখ জ্যোতির্ময়ী দেবীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে সম্মানিত করে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক প্রদানের মাধ্যমে। রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে ‘সোনা রূপা নয়’ গল্পগ্রন্থের জন্য।

জ্যোতির্ময়ী দেবী উপন্যাস রচনা করেছেন মোট পাঁচটি সেগুলি হল— ‘বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ’, ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’, ‘মনের অগোচরে’, ‘ছায়াপথ’ ও ‘হরিজন উন্নয়ন কথা’ প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ বেশ সাড়া ফেলেছিল পাঠকমহলে। দেশভাগ, দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাসে সুতারা নামে একটি মেয়ের কঠিন জীবন-সংগ্রামের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানে ছুঁয়েছিল বলে সুতারা এক জীবন্ত কলঙ্ক হয়ে যায়। মুসলমান যে তাকে বাঁচিয়েছিল সেকথা কেউ বলে না। তাঁর বহু লেখায় বারবার এসব কথা ঘুরেফিরে এসেছে। যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদি শুধু এই কালে বা সমাজে নয়, অন্য সময়েও, সমাজেও দণ্ড দেয় একমাত্র নারীকেই। আর এই দিকগুলিই জ্যোর্তিময়ী দেবী নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে।

জ্যোর্তিময়ী দেবীর ছোটগল্পের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নয়, শতাধিক গল্প বিভিন্ন গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাঁর

লেখা গল্প-গ্রন্থগুলি হল — 'রাজযোটক', 'আরাবল্লীর আড়ালে', 'ব্যান্ডমাস্টারের মা', 'আরাবল্লীর কাহিনী' ও 'মর্ত্যের অপ্সরা'। এই গল্প গ্রন্থগুলিতে বিচিত্র সব গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। রাজস্থান বিষয়ক গল্পের পাশাপাশি পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের চিরন্তন নারী সমাজের গল্প উপস্থাপিত হয়েছে।

এছাড়া প্রবন্ধগ্রন্থ 'চিরন্তন নারী সমস্যা', 'একটি তীর্থপরিক্রমা', 'সময়ও সুকৃতি' এবং কবিতা-সংকলন 'চক্রবাক' পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি তাঁর আত্মজীবনী 'স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ'। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছেন —

''অবিস্মরণীয় অনেকের কথাই এতে সন্নিবেশিত হয়নি — যা হওয়া দরকার ছিল। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, ক্ষিতিমোহন সেন, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো, যেমন প্রমথনাথ বেশী, যিনি আমার ভাই সমীর মজুমদারের সহপাঠী ছিলেন অথবা প্রবোধ সান্যাল, ইনিই আমার ভাই গিরিজানাথের সঙ্গে পড়তেন — এদের কথা লিখতে পারিনি। ব্যক্তি ও স্মৃতির সঙ্গে ঠিক ঠিক সঙ্গতি রেখে লেখা হয়ে ওঠেনি, এজন্য আক্ষেপ রইল। স্মৃতির ছোট ছোট চিত্রগুলি কখনো সংগ্রহ করে প্রকাশ করে ওঠা হবে কিনা তা পরের কথা।''৩

বাংলা সাহিত্যকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। বাংলা সাহিত্যের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অবশ্যই তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সুবীর রায়চৌধুরী ও অভিজিৎ সেন সম্পাদিত জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-১, দে'জ পাবলিশিং ও স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, এপ্রিল,২০১১, পৃষ্ঠা - ৩৯৫

২. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩৪৪

৩. গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত ও সহায়তায় অশোকা গুপ্ত ও মঞ্জুশ্রী সিংহ জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাসংকলন-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১১, পৃষ্ঠা - ৪৫৩

আশালতা সিংহের জীবন ও সাহিত্য

ASHALATA SINGHER JIBAN O SAHITYA

আশালতা সিংহের জন্ম ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই, বর্তমান বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুর শহরে। পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার ও মাতা যোগমায়া দেবী। তাঁর পিতা ছিলেন শিল্পী মানুষ। সেতার ও ছবি আঁকায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। পিতামহ চন্দ্রশেখর সরকার ছিলেন তৎকালীন ভাগলপুরের একজন নামকরা ব্যক্তি। পিতা ও পিতামহ দুজনেই পেশায় ছিলেন ভাগলপুরের প্রতিষ্ঠিত উকিল। তাঁদের আদিনিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায়। তবে তাঁদের শেষ তিন পুরুষের জীবন অতিবাহিত হয়েছে ভাগলপুরেই। তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য, মান, যশ তাঁকে সুন্দর একটি সাহিত্যিক মনন দিতে সাহায্য করেছিল। আশালতার পড়াশোনার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্বের মতো বিবিধ বিষয়ের প্রতি তাঁর ছিল তীব্র আগ্রহ। ছেলেবেলার স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন —

"শুধু বই আর বই। আমি বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসতাম। বই পেলে আমি যেন সব ভুলে যেতাম।"[১]

দুই বোন ও সাত ভাইয়ের মধ্যে আশালতা ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁর শিল্পীমনের উপর তাঁর পিতার প্রভাব পড়েছিল অনেকখানি। তবে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে আশালতার স্বাধীন জীবনে ছেদ পড়ে। আশালতার পড়াশোনা, শিল্প, সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পিতা সাহিত্যানুরাগী ও আধুনিক হলেও সমাজ-বিদ্রোহী ছিলেন না। সামাজিক রীতিনীতির বাইরে যাওয়া তাঁদের অভিপ্রায় ছিল না। তাই আশালতাকে অল্প বয়সেই পাত্রস্থ করা তাঁর কাম্য মনে হয়েছিল।

আশালতার বিয়ে হয়েছিল বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রামে। শ্বশুরবাড়ি ছিল সুপ্রাচীন রক্ষণশীল জমিদার পরিবার। আশালতা পিতৃগৃহে যে উদার মুক্তমনা পরিবেশ পেয়েছিলেন স্বামীগৃহে এসে তা লুপ্ত হল।

"যে সংগীত ও সাহিত্যিক আবহাওয়ায় আশালতা বড়ো হয়েছিলেন সেই সংগীতচর্চা বা সাহিত্যরচনার কোনো অবকাশই তাঁর শ্বশুরবাড়িতে ছিল না।"[২]

তাঁর শ্বশুর হলেন অবিনাশচন্দ্র সিংহ, শাশুড়ি স্নেহলতা সিংহ। স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ছিলেন তখন কলকাতা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। তিনি ডাক্তারি পাস করার পর কিছুদিন সিউড়িতে প্রাকটিস করলেও পরে চলে আসেন ভাগলপুরে। স্থানীয় আদমপুরা অঞ্চলে আশালতা দীর্ঘ দশ বছর জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রতিবেশী হিসেবে কাছে পেয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর সান্নিধ্য আশালতাকে সমৃদ্ধ করেছিল অনেকখানিই।

বিবাহ পরবর্তী জীবনে আশালতা বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করার সুযোগ না পেলেও তাঁর পিতার সুব্যবস্থাপনায় তাঁর শিক্ষালাভের বাসনা পূরণ হয়েছিল অনেকখানিই। বাড়িতেই তিনি আশালতার শিক্ষার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তেজনারায়ন জুবিলি কলেজের অধ্যাপকগন তাঁকে গৃহশিক্ষক হিসেবে পড়াতেন। তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার খোরাক জোগাতেন দিলীপ কুমার রায়। বিলেত থেকে পার্সেল করে বই পাঠাতেন লেখিকা আশালতাকে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এবং দিলীপ কুমার রায়ের চেষ্টায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

আশালতা দেবী রচিত 'নারী' নামক প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায়। 'নারী' নামাঙ্কিত অপরদুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রবন্ধটি পাঠ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লেখিকা আশালতাকে এক দীর্ঘ পত্র পাঠিয়েছিলেন যা 'নারীর মনুষ্যত্ব' শিরোনামে বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর দশ বছরের সাহিত্যজীবনে কুড়ি বাইশখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত ঘটে মাত্র ষোলো বছর বয়সে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম' প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বড়ো গল্পের আকারে। পরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপে উপন্যাসে পরিণত হয়।

"প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম' (১৯২৭) তাঁকে যে খ্যাতি এনে দিয়েছিল অল্পবয়সী লেখিকার মাথা ঘুরে যাওয়ার পক্ষে তা ছিল যথেষ্ট।"৩

আশালতা সিংহ তাঁর লেখায় নারীকে আলাদাভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বাঙালি সমাজে নারী ও পুরুষের বৈষম্যকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর বেশ কিছু গল্প উপন্যাসে তাঁর এই নারীবাদী ভাবনা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধিও তাঁকে এমন ভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছিল বলেই মনে হয়। তাঁর সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যাই বেশি। এছাড়া কিছু প্রবন্ধ ও দুখানি নাটক রচনা করেছেন তিনি।

আশালতা সিংহের লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — 'অমিতার প্রেম', 'দুই নারী', 'মানসী', 'অষ্টমী', 'বিয়ের পরে', 'মুক্তি', 'সমর্পণ', 'সহরের মোহ', 'কলেজের মেয়ে', 'নতুন অধ্যায়', 'স্বয়ম্বরা', 'ভুলের ফসল', 'জীবনধারা', 'একাকী' প্রভৃতি।

আশালতা সিংহের গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা মোট চারটি। এছাড়াও তাঁর অসংখ্য গল্প অগ্রন্থিত রয়ে গেছে, যেগুলি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। তাঁর চারটি গল্পগ্রন্থের অন্যতম 'অভিমান' গ্রন্থের গল্পগুলি হল — 'অভিমান', 'নিরূপম', 'স্বাধীনতা ও সন্মান', 'অন্তর্ধান', 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল', 'স্পেশালাইজেশন' ও 'পরাজয়'। আশালতা সিংহের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থের নাম 'অন্তর্যামী' পাঁচটি বড়ো গল্পের সমাহারে গ্রথিত। গল্পগুলি হল —'অন্তর্যামী', 'প্রেমে পড়া', 'অপমান', 'পরিবর্তন' ও 'রমা'। মোট উনিশটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থটি। মানুষের মনের অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন, মানবিক মূল্যবোধহীনতা, পণপ্রথা, শহর ও গ্রামীণ সমাজের জীবন সমস্যা, বেকারত্ব ইত্যাদি নানান জটিল সমস্যা এই গল্পগুলির মুখ্য বিষয়। তবে সবকটি গল্পই যে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য মেনে চলেছে এমনটা বলা যায় না। কিছু গল্পে আশালতা সিংহের ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই গল্প-গ্রন্থের অন্তর্গত কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প হল — 'লগণ বয়ে যায়', 'জানালা', 'বাণীর নেশা', 'প্রশ্নপত্র', 'এপিঠ ওপিঠ', 'পূর্বাপর' প্রভৃতি। কুড়িটি ছোট গল্পের সমষ্টি নিয়ে প্রকাশিত হয় আশালতার চতুর্থ গল্প সঙ্কলন 'মধুচন্দ্রিকা'। আয়তন ও বিষয় সংরূপের গুণে বেশ কয়েকটি গল্প সার্থক ছোট গল্পের রূপলাভ করেছে। এই গল্প-গ্রন্থের কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প হল — 'মধুচন্দ্রিকা', 'বিরহ ও মিলন', 'চিরন্তন ভ্রান্তি', 'বুদবুদ', 'বিনাপণের মর্যাদা', 'কনেদেখা', 'পাশেরঘর' প্রভৃতি।

উক্ত চারটি গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি আশালতার এমন গল্পের সংখ্যাও নিতান্ত স্বল্প নয়। এ পর্যন্ত মোট

ষাটটি গল্প পাওয়া গেছে। যে গল্পগুলির চুয়ান্নটি 'আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন-১' ও 'আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন-২' গ্রন্থদুটিতে স্থান পেয়েছে। বাকি ছয়টি গল্প সংকলনের কোনোটিতেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গল্প ছয়টি হল — 'বন্দনা', 'পুরুষের মন', 'নন্দিনী', 'মানুষের মন', 'বঞ্চিত' ও 'ইন্দ্রজাল'। আমাদের মনে হয় আশালতা দেবীর আরো কিছু গল্প অগ্রন্থিত অবস্থায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আশালতা সিংহ শুধু গল্প উপন্যাস রচনায় সীমাবদ্ধ থাকেননি। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তিনি অনায়াসে বিচরণ করেছেন। গল্প উপন্যাস ব্যতীত তিনি একটি নাট্য সংকলন প্রকাশ করেন, যাতে দুটি নাটক গ্রথিত হয়। নাটক দুটি হল — 'সুরের উৎস' ও 'পুনরাবৃত্তি'।

আশালতা সিংহ রচিত প্রবন্ধগুলি হল —'নারী', 'শরৎচন্দ্র ও গলস্‌ওয়ার্দি', 'শ্রী বুদ্ধদেব বসু এবং বাস্তবতা', 'সাহিত্যে অবহেলা', 'সমী ও দীপ্তি' প্রভৃতি।

পরিণত জীবনে আশালতা সিংহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হয় আশাপুরী।

সন্ন্যাসিনী আশালতা লিখিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। সেগুলি হল — 'সতাংপ্রসঙ্গ', 'লীলাকথা কাহিনী', 'অমর জীবন', 'পরম পুরুষ শ্রী শ্রী মোহনানন্দ', 'মহারাজ', 'শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবনচরিত' প্রভৃতি।

সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লীলা পুরস্কারে সম্মানিত হন। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। লেখিকা আশালতা সিংহ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে ৭২ বছর বয়সে দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সুস্মিতা রায়, আশালতা সিংহ : স্মরণে মননে, ব্যতিক্রমী সাহিত্য প্রতিভা : আশালতা সিংহ, সম্পাদনা : জয়ন্তী সাহা, কৌশিক দাশগুপ্ত ও তিস্তা দত্তরায়, যোধন প্রকাশনী, বর্ধমান, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬৯

২. সম্পা সিনহা সম্পাদিত আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক, আশাদীপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৪০

৩. সম্পা সিনহা, ঔপন্যাসিক আশালতা, ব্যতিক্রমী সাহিত্য প্রতিভা : আশালতা সিংহ, সম্পাদনায় জয়ন্তী সাহা, কৌশিক দাশগুপ্ত ও তিস্তা দত্তরায়, যোধন প্রকাশনী, বর্ধমান, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৯৭

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থান
JYOTIRMOYEE DEVIR CHOTO GOLPE PROTIFOLITO NARIR SAMAJIK ABASTHAN

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটগল্পগুলি পড়লে দেখা যায় নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক তাঁর ছোটগল্পে উদ্ঘাটিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের রাজস্থান-বাস, অল্পবয়সে বৈধব্য, সমাজের মানুষের প্রতি একাত্মবোধ এবং বিশেষ করে নারীদের জীবন সম্পর্কে সহৃদয় ভাবনার ফসল তাঁর ছোটগল্পগুলি। তাঁর ছোটগল্পে নারীদের সামাজিক অবস্থানের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

'আরাবল্লীর আড়ালে' এবং 'আরাবল্লীর কাহিনী' গল্প-গ্রন্থের অনেক গল্পেই রাজস্থানী নারীদের জীবন-যন্ত্রণা অতি দরদের সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে —

''মায়ের দেওয়া অন্নব্যঞ্জনের মতো তাঁর গল্পগুলি স্বাদুতায় স্নিগ্ধ, কোথাও মুখের হাসি, কোথাও বা চোখের জল গল্পপাঠের ফলশ্রুতিরূপে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকে।''১

রাজস্থান-বিষয়ক গল্পগুলিতে রাজপুত রাজাদের হারেমের চিত্র, কন্যাসন্তান হত্যা, বাঈজিদের জীবন-যন্ত্রণার নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে রয়েছে 'সুমেরু রায়', 'বাঈজিলাল', 'বেটি কা বাপ', 'ফণীমনসার বন', 'সেপাই পিসিমা', 'ধাপী', 'খুশনজরজী' প্রভৃতি গল্প। জ্যোতির্ময়ী দেবীর পিতা জয়পুরের সামন্তরাজার দেওয়ান ছিলেন, সেই সূত্রেই তিনি রাজ-পরিবারের অন্দর-মহলের অনেক কাহিনির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন। সেখানে দেখেছেন নারীদের কত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। 'বেটি কা বাপ' গল্পে দেখা যায় —

''ছ'ছটা মেয়ে কারো গায়ে একটু আঁচড় লাগেনা অসুখ বিসুখের। যদিও প্রথম চারটে নাতনী ঠাকুমার ভারী আদরের। গোদাবরী, গঙ্গা, জানকী, যমুনা আর গৌরীও। সবাইকেই ভুরিবাঈ ভালোবাসে, মায়া পড়ে গেছে। মরে যাক সেটা খুব মনে হয় না। তবে এই নতুন ছোট্টটা এটার কোনো অসুখ হলে তার দুঃখ ছিল না .... বরং সুবিধাই হতো ... ... কী সুবিধা? সে ভুরিবাঈই জানে।''২

জ্যোতির্ময়ী দেবী শুধু রাজস্থানী অন্তঃপুরিকাদের জীবনের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন এমন নয়। বাংলাদেশের নারীদের জীবন-যন্ত্রণার নানান কাহিনি তিনি অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শিক্ষালাভের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নারী পুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর গল্পের পটভূমি রচিত হতে দেখা যায়। 'দর ও দস্তুর', 'অণৃতভাষিণী', 'পুত্রেষ্ঠি', 'প্রতিলোম', 'যাঞ্ঞা', 'তেপান্তরের মাঠ', 'নোরা ও নারী', 'হ্রস্ব ও দীর্ঘ' ইত্যাদি গল্প এই পর্যায়ের। আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান যেন কখনো গৃহপালিত অবলা জীবটির মতোই যেখানে গৃহস্থের প্রয়োজনে নারী নানা বাঁধনে বাঁধা। এই ধরনের গল্পগুলিতে নারীদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবনকে একেবারে নস্যাৎ করা হয়েছে। তাঁর এমন একটি গল্প হল 'রূপ', যেখানে রূপহীনতার জন্য প্রথমা স্ত্রীকে অস্বীকার করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন অনুকূলচন্দ্র। যদিও বৃদ্ধবয়সে প্রথমা স্ত্রী সরোজিনীর তীর্থক্ষেত্রে মৃত্যুর খবর শুনে অনুকূলচন্দ্রের মনে অনুশোচনা হয়। তার মনে হতে থাকে –

''কেন এমন রূঢ় কথা স্পর্ধা করে সেই শান্ত ভদ্র তরুণী নারীকে বলেছিলেন! বিধাতা তাকে সুন্দর করেননি।

সে তো তার অপরাধ নয়। আজ মনে হয় এই জীবনে একদিনের জন্যও যদি বলতে পারতেন তাকে যে আমি অন্যায় করেছি, ভুল করেছি.... । তখনো বলেননি। আর এখন তো বলা-বলির দিন শেষ হয়ে গেল চিরদিনের মতো।

তার কাছে বসা নিজের রূপহীনা কন্যার দিকে চোখ পড়ল। যার বিয়ে দেবার সময় কত কটু রূঢ় কথা শুনেছেন।"[৩]

জ্যোতির্ময়ী দেবীর কোনো কোনো গল্পে কমবয়সী বিধবা নারীদের উপর সমাজের অনুশাসন, নির্দয়তা দেখানো হয়েছে। 'ক্ষণপভা', 'একাদশী' ইত্যাদি এই শ্রেণির গল্প। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'একাদশী' গল্পটি। বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে এই গল্পটিতে। 'একাদশী' গল্পে দেখি–

"মা মেয়েকে তাড়া দিচ্ছেন। গলায়, গালে, মুখে হাত বুলিয়ে ডাকছেন, ওমা শানু, জলটুকু খা। কাল সারারাত জল জল করেছে আমার মা। আমি দিইনি। বলেছি এই ভোর হয়ে এল, এইবার দোব, ওমা শানু চোখ চা মা। সবাই বারণ করলে দিতে। কেন দিলাম না, ওমা। বললে পাপ হবে।"[৪]

সমাজের পতিতা নারীদের দুর্দশা নিয়েও জ্যোতির্ময়ী দেবী কলম ধরেছেন। যাদের আমরা পতিতা বলে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করি তারা কাদের দ্বারা পতিত হয় সে প্রতিবাদ কেউ করি না। যাদের লালসার জন্য তারা পতিতা বলে গণ্য হন সমাজে পতিতাদের ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে দেন তারাই। এই শ্রেণির গল্প 'মর্ত্যের অপ্সরা', 'তারা রূপবতী' ইত্যাদি। 'তারা রূপবতী' গল্পে লেখিকাকে বলতে শুনি–

"সেইসব কালের ক্ষণিক পথে আমি শুধু তাদের তিনজনকে দেখেছিলাম মাত্র। দেখেছিলাম আশ্চর্য রূপ। শুনেছিলাম আশ্চর্য কণ্ঠে গান। দেখেছিলাম অপূর্ব নৃত্য। সে রূপ গান নাচ বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সম্ভব নয় বর্ণনা করা। শুধু মনে হয়েছিল 'আনারকলি', নূরজাহানের চেয়ে তারা রূপবতী ছিল। ফৈজী বেগম, সিরাজের সব বেগমের চেয়ে রূপবতী ছিল নিশ্চয়।"[৫]

রাজস্থান-বিষয়ক গল্প ছাড়াও জ্যোতির্ময়ী দেবী পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি উত্তর ভারতের নারী সমাজের করুণ আলেখ্যও ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কিছু কিছু গল্পে। মথুরা বৃন্দাবনের তীর্থে বসবাসকারী নারীদের জীবনও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এ সমস্ত গল্পে। 'অহল্যা দ্রৌপদী তারা', 'রাজা রানী ও কেশর', 'একটি সেকেলে লেখক' ইত্যাদি গল্প এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে।

দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপট, মন্বন্তর, স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী বেশকিছু গল্প রচনা করেছেন। সেখানেও নারীরা কীভাবে লাঞ্ছনার শিকার হয় তা দেখানো হয়েছে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', 'একজাত', 'সেই ছেলেটা', 'টিনের মাংস', 'উৎসর্গীত' ইত্যাদি গল্প এই পর্যায়ে পড়ে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ছোটগল্পে দেখি দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতি নেমে আসে দুর্গার জীবনে।

"সেভাবে পালিয়ে যাবে? কোথায় পালাবে? বাইরেও তো ওরাই আছে। গলায় দড়ি দেবে? ডুবে মরবে? নদী আছে কোথায়? পুকুর আছে কী? আছে যেন। আবার ভাবে, আসবে। সুদাম আসবে নিশ্চয়ই।"[৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুদূর রাজস্থান থেকে শুরু করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ হয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গৃহকোণের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্তঃপুরিকাদের দুঃখ বেদনার শরিক হয়েছেন তিনি। এখানেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিশিষ্টতা।

তথ্যসূত্র ঃ

১. গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন -২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১১, পৃষ্ঠা-১২৪

২. ঐ, পৃষ্ঠা - ২০৬-২০৭

৩. গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন -৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২৯৬

৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৯৭

৫. গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন -২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১১, পৃষ্ঠা-২৯৭

৬. গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন -৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২৮৭

আশালতা সিংহের ছোটগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থান

ASHALATA SINGHER CHOTO GOLPE PROTIFOLITO NARIR SAMAJIK ABASTHAN

ছোটগল্পকার আশালতা সিংহ মোট চারটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে নারীর সামাজিক অবস্থানের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও তাঁর অগ্রন্থিত গল্পের সংখ্যাও নিতান্ত স্বল্প নয়। আশালতার প্রায় অর্ধশতাধিক গল্প অগ্রন্থিত অবস্থায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই গল্পগুলিও শিল্পগুণে বিশিষ্ট। তাঁর গল্পে নারী চরিত্রের বিচিত্র দিক প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। আশালতা সিংহ সমকালীন সীমাবদ্ধতার বেড়াজালকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন নিজস্ব যুক্তিনিষ্ঠা, তীব্র বাচনভঙ্গি, বক্তব্যের স্পষ্টতায়। তাঁর এই প্রতিবাদ-মুখর মানসিকতার জন্য তিনি তীব্রভাবে সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' লেখিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনায় ভরিয়ে দেয়, ক্ষত-বিক্ষত করে। তবে কোনো অবস্থাতেই তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলেন না।

আশালতা সিংহের সমাজ-সচেতনতা ছিল তীব্র। সেই সূত্রেই সমকালীন সমাজ এবং তৎসম্পর্কিত নানান সমস্যা বারেবারেই উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। পণপ্রথা, জাত-পাত, বেকার সমস্যার মতো সামাজিক সমস্যা তাঁর একাধিক গল্পেই উঠে এসেছে। সমাজ সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করতেই যেন লেখিকা কলম ধরেছেন এই জাতীয় গল্প লেখায়। এই জাতীয় লেখাগুলো সচেতন পাঠকের মনকে সত্যিই নাড়া দিয়ে যায়। এই শ্রেণির গল্পের মধ্যে 'বিনাপণের মর্যাদা', 'কনে দেখা', 'মৃত্যুর আলো', 'নারীর আলো', প্রভৃতি। 'বিনাপণের মর্যাদা' গল্পে দেখি বড়োলোক বাড়ির বিয়েতে উপহার সামগ্রীর প্রাচুর্য। তবু নগদ পণ দিতে হয়না বলে তাদের গর্বের অন্ত নেই। পাশাপাশি এক গরীব পরিবার পণের টাকা ঠিকমতো জোগার না করতে পেরে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারে নিজ কন্যার বিয়ে দেবেন বলে মনস্থির করে। এই গল্পে বড়োলোক বাড়ির কোনো এক মহিলাকে বলতে শুনি —

''ওদের যেমন ছেলে, ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুণে নিতে পারতেন যে। কিন্তু তাই বলে সমাজে নিজেদের মান-সম্ভ্রম আছে তো? ওদের বাড়ির বৌ হয়েছে, সে হীরে ছাড়া পরেনি কখনো। সেটুকু বজায় রাখতে হবে তো?''[১]

তাই হীরের সুট, ফার্ণিচার, রূপোর টি-সেট, সোনার গোলাপ-পাশ, আর ফ্লাওয়ার-ভাস, আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি সমস্তই দেওয়া হয় উপহার বা যৌতুক হিসেবে।

তাঁর কিছু কিছু গল্পে বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পের জাল বুনে উঠতে দেখা যায়। এগুলিতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনার গুরুত্বই প্রধান হতে দেখা যায়। এগুলিকে বলা যেতে পারে ঘটনাপ্রধান গল্প। এর মধ্যে লেখিকা আশালতার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাও কোনো কোনো গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। এই শ্রেণির গল্পগুলি সমাজের তিন শ্রেণির মানুষকে নিয়েই রচিত হয়েছে, অর্থাৎ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষজন। এই শ্রেণির গল্পের মধ্যে 'কাসুন্দি', 'বেদনার বিভিন্নতা', 'বাণীর নেশা', 'জানালা', 'নিরূপম' ইত্যাদি। গল্পগুলির বিচিত্র জালবিন্যাস পাঠককে ভাবিয়ে তোলে সন্দেহ নেই। তাঁর 'কাসুন্দি' ছোটগল্পে দেখি আধুনিক প্রগতিশীল নারী বিজলী মুখে নারী প্রগতির কথা বললেও বাস্তবে সে কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারে না। তাই 'কাসুন্দি' নিয়ে লেকচার দিলেও তাঁর স্বামীকেই ঘরের যাবতীয় কাজ করতে হয়। এই গল্পের এক জায়গায় বিজলীকে বলতে শুনি —

"তা দেখ, ঝি মাছ আনলে ঝোলটা তুমিই করে নিও। আমি ততক্ষণ 'কাসুন্দি'র উপর নোটটা লিখে ফেলি। অনেক পুরাতত্ত্বের বই ঘাটতে হবে। অনেক কোটেশন টুকতে হবে। সময় নেবে খানিকটা। স্বামী কহিলেন, তাই যাও। তাহলে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মেয়েরা এরোপ্লেনে পাইলট হচ্ছে। আর এই সামান্য মাছের ঝোলটুকু আমি রাঁধতে পারবো না। পুরুষদের কি তোমরা এতই অযোগ্য মনে কর?"২

এইভাবে লেখিকা আশালতা এই ধরনের মেকি শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

আশালতার আর এক শ্রেণির গল্পে দেখা যায় নরনারীর দাম্পত্য, প্রেম ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল কাহিনি। এছাড়াও পারিবারিক নানান সংকট, উত্থান-পতন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হাসি-কান্না ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় এই শ্রেণির গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে। আশালতার মানুষের অন্তরের সঙ্গে গভীর যোগ ছিল বলেই এই জাতীয় গল্প রচনায় সাফল্যলাভ করেছেন। এই শ্রেণির গল্পগুলিকে বলা যায় প্রেম, দাম্পত্য ও পরিবার কেন্দ্রিক গল্প। 'স্বাধীনতা ও সম্মান', 'অপমান', 'পূর্বাপর' প্রভৃতি গল্প এই পর্যায়ের। 'অপমান' গল্পের কাহিনিটি গড়ে উঠেছে পুষ্প, আভা ও দীপেশকে নিয়ে। এই তিন নরনারীর মানসিক দ্বন্দ্ব, আবেগ প্রভৃতির টানাপোড়েন এই গল্পের ভিত। একদিন পুষ্পলতাকে দীপেশ মাস্টারনী বলে অবজ্ঞা করেছিল, কিন্তু পরে সেই দীপেশই স্বীকার করেছে—

"একজনকে একদিন অন্যায় করে না বুঝতে পেরে অপমান করেছিলুম সে আজ ভারি সুন্দর করে তার প্রতিশোধ নিয়েছে।"৩

আশালতা মানবমনের জটিল রহস্য উন্মোচন করেছেন তাঁর একাধিক ছোটগল্পে। মানুষের মনের অন্তর্নিহিত রহস্য, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রভৃতি অনায়াস দক্ষতায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। এই গল্পগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক গল্প বলা যেতে পারে। 'অন্তর্যামী', 'অন্তর্ধান', 'প্রেমে পড়া', 'রমা' ইত্যাদি গল্পে নারীমনের অন্তর্নিহিত ভাবরহস্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। নারীমনের অন্তর্নিহিত রহস্যটি অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'প্রেমে পড়া' গল্পের নায়িকা অলকার মাধ্যমে। এই গল্পের নায়িকাকে এক জায়গায় বলতে শুনি —

"হ্যাঁ এর আগেই আমি প্রেমে পড়েছি। ভাবছেন, বিয়ের আগে প্রেমে পড়া খারাপ? কখনো না। প্রেমে যদি পড়তেই হয়, বিয়ের আগেই সেটা মিটিয়ে ফেলা ভালো। কেন না যে মেয়ে বিয়ের আগে প্রেমে পড়েছে, সেই বিয়েকে যথার্থভাবে নিতে পারে এবং বুঝতে পারে।"৪

আশালতা তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে গ্রাম ও শহরজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কিছু কিছু গল্পে তাই দেখা যায় গ্রাম ও শহরজীবনের বিচিত্র আলেখ্য। মূলত শহর ও পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক, তাদের মনস্তত্ত্ব, আচার-আচরণ, শিক্ষা ও সমাজ ইত্যাদির সাথে পরিচিত ছিলেন তিনি সেই অভিজ্ঞতার সূত্রেই তাঁর একাধিক গল্পেই গ্রাম ও শহরজীবনের নানান বিচিত্র দিক প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 'নীর ও ক্ষীর', 'নবযুগ', 'রূপান্তর' প্রভৃতি এই শ্রেণির গল্প। 'ভালোলাগা' গল্পে এক শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে ছায়ার মধ্যে প্রথমে শহুরে আভিজাত্য ও অহংকার দেখা যায়। ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামে থাকা সে পছন্দ করে না। কিন্তু শাশুড়ির শেষকৃত্যের জন্য সে গ্রামে আসে এবং গ্রামের পরিবেশের স্নিগ্ধতা ও তার জা সবিতার সেবাপরায়নতা ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে আর কিছু দিন গ্রামে থেকে যেতে মনস্থির করে। এই গল্পে আশালতার পল্লীগ্রামের প্রতি মুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আশালতা তাঁর দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতায় তাঁর ছোটগল্পের ভুবন সাজিয়ে ছিলেন, যেখানে

নারীদের সামাজিক অবস্থানের বিভিন্ন দিক অতি দরদের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান যুগের পাঠকেরা এই জাতীয় গল্পগুলি পাঠ করে তৎকালীন সমাজের নারীদের সম্পর্কে অনেক অজানা কথাই জানতে পারবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী সম্পাদিত আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন-২, দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, জুন, ২০০৭, পৃষ্ঠা-২০০

২. ঐ, আমি পৃষ্ঠা-১০৩

৩. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৭

৪. অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী সম্পাদিত আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন-১, দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, এপ্রিল, ২০০৬, পৃষ্ঠা-২২৫

জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের ছোটগল্পে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক অবস্থানের তুলনা

JYOTIRMOYEE DEVI O ASHALATA SINGHER CHOTO GOLPE PROTIFOLITO NARIR SAMAJIK ABASTHANER TULANA

জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহের ছোটগল্পে নারীর সামাজিক অবস্থানের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবার প্রথমেই নজরে আসে তা হল নারীবাদী চিন্তাধারা উভয় লেখিকারই ছোটগল্পের এক পরিচিত দৃশ্য। তাঁরা দুজনেই সমাজের মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন, সমাজের মানুষের অন্তর্নিহিত সুখ-দুঃখ, না-পাওয়ার বেদনা, অধিকারহীনতা, বৈষম্য ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তাঁদের। নারীবাদী ভাবনা তাঁদের গল্পের অন্যতম বলিষ্ঠ স্তম্ভ হলেও তথাকথিত মানবী বিদ্যা (Women Studyes) বলতে যা বোঝায় তার কোনো ধারণা সেই সময় গড়ে ওঠে নি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটগল্পে শুধু বাংলাদেশই নয়, উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় নারীচরিত্রও সমানভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। নারী জাগরণের কথা সোচ্চারকণ্ঠে বলে গিয়েছেন লেখিকা। তাঁর রাজস্থান-বাস, উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় জনগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগই তাঁকে এই জাতীয় গল্প রচনায় সাফল্য জুগিয়েছিল। সমাজের প্রায় প্রতিটি কোণের নারীচরিত্র তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। রাজস্থান, পাঞ্জাবের নারীদের নানা চিত্র তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সাবলীল ভঙ্গিতে। রাজস্থানের রাজান্তঃপুর থেকে শুরু করে সাধারণ সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তাঁর অনেক ছোটগল্পের পটভূমিরূপে পাওয়া যায়। তাঁর এই শ্রেণির গল্পগুলি রাজস্থানের রাজ্য, প্রাসাদও অবরোধের জীবনকে কেন্দ্র করে বাস্তব সত্যের কাঠামোর উপর রচিত। বংশগৌরব রক্ষার্থে শিশুকন্যা হত্যার মতো অমানবিক কাহিনি, রাজান্তঃপুরে হারেমের নারীদের দুর্দশা, বিবাহিত জীবনে তাদের অধিকারহীনতা ইত্যাদি নানা বিষয় ফুটে উঠেছে এই জাতীয় গল্পগুলিতে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর অন্যতম এক ছোটগল্প 'বাঈজিলাল'। এই গল্পে দেখা যায় অপরূপ সুন্দরী মেয়ে কেশরের দুর্দশার করুণ কাহিনি। নানীর আদরে মানুষ হওয়া কেশর বিয়ের পর কীভাবে লাঞ্ছনার শিকার হয় তাই দেখানো হয়েছে এই গল্পে। শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভে কেশরকে বিয়ে করার পর তার স্বামী কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় বিয়ে করে বসে। সমস্ত সম্পত্তি হাতানোর পর কেশরকে বিতারিত করা হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে। শেষে তার ঠাই হয় বৃন্দাবনের কোনো এক মন্দিরে। তার সম্পর্কে লেখিকার উপলব্ধি—

"জানি এমনই হয় মেয়েদের ভাগ্য। বিশেষ করে সাধারণ গ্রামের জীবন ও প্রথাতে হয়তো এরকমই হয়। সন্তানহীনা গ্রাম্যবধূ, এদিকেও অনাথা মেয়ে — এই তো হবার কথা। কিন্তু সবইতো তার, তারাই পেতো — সেই ছেলেটিই তো সব পেতো — বা সকলে মিলে নিত, তাহলে কী জন্য সরিয়ে দিল বা তাড়িয়ে? তার নানীর প্রাণপণ সঞ্চয়ের কণাটুকু তাঁর নিজের রইলনা। তবু তারা ঠকালে ওকে। ছেলেও তো হয়নি। তাহলে তো তাড়াবার বা শত্রুতার অর্থ বুঝতাম।"[১]

আবার তাঁর আর এক শ্রেণির গল্পের মধ্যে পাই পণপ্রথা, বিবাহিত মেয়েদের জীবনের লাঞ্ছনা, বিধবা নারীদের জীবন-যন্ত্রণা, পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের নির্যাতন, পরিবারে পুত্র এবং কন্যা সন্তানের মধ্যে বৈষম্য ইত্যাদি নানা কাহিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লেখিকা অতি দরদের সাথে সেই সমস্ত অন্তঃপুরিকাদের দুঃখ-বেদনার সাথে একাত্ম হয়েছেন। একজন নারী হয়ে নারীদের দুঃখবেদনাকে তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বংশগৌরব রক্ষার্থে কন্যাসন্তান হত্যার এক নিদারুণ নিষ্ঠুর কাহিনি দেখা যায় 'ফণীমনসার

বন' ছোটগল্পে। পুত্র ও কন্যাসন্তানের মধ্যে বৈষম্য এই গল্পটিতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই গল্পে সুজাবাঈকে বলতে শোনা যায় —

''তুমি তো জানো আমাদের খুব বড়ো বংশ। আর যত বড় বংশের রাজপুত হয় তত তাঁর অহংকার দর্প বেশি হয়। তখনকার দিনে খুবই হতো। আমার শ্বশুরের বাপের সময়ে একবার ঐ মেয়ের ঘর ছেলের বংশ নিয়ে খুব ঝগড়া হয়। সেই সময়ে এরা তাদের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে একেবারে চলে তো আসেই, আর প্রতিজ্ঞা করে, ওদের কোন শাখার সঙ্গে আর কোনো ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে না। আর তারাও প্রতিজ্ঞা করে এই মেয়ের মুখ দেখবে না। এদের মেয়ে কখনো নেবে না ওদের কোন বংশের শাখায়। তারপর আমার মামা শ্বশুরের ঘরে মেয়ে আর জন্মাল না। বুঝতে পারছ তো? .... মেয়ে বাঁচত না। হয়েই মরে যেত।''[২]

পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন তিনি। 'দর ও দস্তুর' ছোটগল্পে দেখা যায় কালো মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে পিতা মাতাকে কেমন নাকাল হতে হয়। এই গল্পে শ্যামবর্ণ নিভাকে পাত্রপক্ষ সহজে পছন্দ করে না। তাই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ছোট দুটি মেয়ের বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে পড়েন। কয়বার পাত্রপক্ষ কন্যা নিভাকে দেখে যাওয়ার পর তার বাবার কাছে মা জানতে চান পাত্রপক্ষ কী বলে গেল? জবাব কবে দেবে? পছন্দ হয়েছে? নিভার বাবা জানায় —

''ওরা বলে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের, রং ফর্সা করার উপায়ও একটা বাতলে দিয়েছে, সেটা হলেই ওরা বিয়ে সামনে বৈশাখে দেবে। উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন, সে কী উপায়? কিছু বেশি টাকা। নগদ ওরা নেয়না, কিন্তু রকম নেয়।''[৩]

এই রকম অনেক গল্পেই সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে, সামাজিক অবরোধের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। নারীবাদী ভাবনাটি উচ্চকিতে বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি।

অন্যদিকে আশালতা সিংহ তাঁর গল্পগুলিতে সমকালীন সমাজের পারিপার্শ্বিক, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক চিত্রের পাশাপাশি পারিবারিক তথা গার্হস্থ্য জীবনের ছবিও সমানভাবে অঙ্কন করেছেন। লেখিকা আশালতার জীবন অভিজ্ঞতাও তাঁর অনেক গল্পে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 'অন্তর্যামী', 'প্রেমে পড়া', 'সেলাই কল', 'মেয়ে মানুষ' ইত্যাদি বিভিন্ন গল্পে নানা সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, সেই সমস্যা থেকে নারীমুক্তির কথাও মেয়েদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তিনি।

আশালতার অধিকাংশ গল্পেই রয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের ইতিবৃত্ত। এছাড়াও উচ্চবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত আধুনিক নারীদের উপাখ্যানও বর্ণিত হয়েছে অনেক গল্পে। সব ক্ষেত্রেই তিনি নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার রক্ষার কথা বলেছেন সোচ্চার কণ্ঠে, তবে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি কোনোমতেই মানতে পারেননি।

সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মকানুন, প্রথা, ধর্মান্ধতা, জাত-পাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো সামাজিক সমস্যা, পণপ্রথা, বিবাহের মাধ্যমে নারীদের পণ্য হিসেবে গণ্য করা ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর অনেক গল্পেই মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। 'বদলে' গল্পটিতে দেখা যায় রেখার পিতা হরকান্তবাবু কলকাতায় এসেছেন কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করতে। সেজন্য কন্যার মামার বাড়ির নিকট তিনি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। হরকান্তবাবু এখানকার আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে ঠিকঠিক মানিয়ে উঠতে পারেন না। তাই রেখাকে পাত্রপক্ষের

উপযোগী করে তুলতে রবীন্দ্র সংগীত, সিনেমা সংগীত, বা রেডিও সংগীতে পারদর্শী করে তুলতে চান তিনি। সেই সাথে সংস্কৃত, ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শিনী হতে টোলের পণ্ডিতের কাছে মেয়ের সংস্কৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন তিনি। পাত্রপক্ষের সামনে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ করতে রেখা মেঘদূত, কুমারসম্ভব থেকে বাছা বাছা শ্লোক আবৃত্তি করে। এছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, রান্না প্রভৃতি বিষয়েও পারদর্শিতা যাচাই করা হয়। এর পাশাপাশি গানের ফরমাস ও শেলির কবিতার মর্ম উদ্ধার করেও জানাতে হয়েছে। এত কিছু করেও পাত্রপক্ষের মন জয় করতে সে ব্যর্থ হয়।

এরপর রেখাকে আরও অভিজাত ধনী পাত্রের উপযুক্ত করতে নতুনভাবে তালিম নিতে হয়েছে। আধুনিক কায়দায় ডিনার খাওয়া থেকে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক — সবকিছু তাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে। মেয়েকে বারবার পাত্রপক্ষের কাছে হাজির করানোর জন্য তাদের নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হয়। তবুও কন্যার মায়ের কোনো অনুশোচনা নেই। বরং সে বিশ্বাস করে —

''কথায় বলে মেয়ে মানুষের মন নয় তো যেন জল, যে পাত্তরে রাখবে তেমনই ধারা হবে। এখন ভালয় ভালয় কর্ত্তার ছুটি ফুরোবার আগে ভালো ঘর বর একটি জুটে যায়।''[৪]

শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি নারীর আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার দিকটিতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান যে কতটা শোচনীয় তা আশালতা নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও উপলব্ধি করেছিলেন। নারীকে শুধুমাত্র অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না তিনি, বাইরের জগতের সাথে তাদের পরিচিত করানোর কথা তিনি বারেবারে বলেছেন। 'পূর্বাপর' নামক ছোটগল্পটিতে নমিতা নাম্নী শিক্ষিতা প্রগতিশীল নারীকে উপস্থাপন করেছেন আশালতা। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি যে টেনিস খেলাতেও সমান পারদর্শিনী। আধুনিক সভ্য সমাজের আড্ডায় নমিতার পাশাপাশি অধ্যাপক রজত, ব্যারিস্টার অরুণপ্রকাশের মতো ব্যক্তিরাও সামিল হয়। অরুণপ্রকাশ নারী প্রগতির বিরোধিতা করলেও রজত কিন্তু নারীবাদী কথাবার্তাই বলে যায়। তার মতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কর্মক্ষেত্র সমান হওয়া উচিত। বর্তমান সমাজে নারীদের অন্তঃপুরে বন্দী থাকা উচিত নয়। এহেন প্রগতিশীল রজতের সঙ্গে নমিতার সম্পর্ক গাঢ় হয় এবং পরবর্তীতে তারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় রজতের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন। প্রগতিশীল রজত বিয়ের পর নমিতাকে বাড়ির রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়ানোর জন্য অশ্লীল ভাষায় ভর্ৎসনা করে। হঠাৎ নমিতার মনে পড়ে যায় অতীতের কথা, যখন রজত মেয়েদের পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে কলেজ বক্তৃতা দিয়েছিল। সেই রজতের মুখোশ আজ তার সামনে অনাবৃত হয়ে যায়। তাই সংসারের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করে। গল্পে অধ্যাপক রজত তার স্ত্রী নমিতার উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি বলে তা হল —

''আবার ঐ রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছো। ছেলের মা হয়েছ। বুড়ো হতে চললে এখনও ওসব বেহায়াপনার অভ্যাস গেল না। বলে বলে হার মেনেছি। যেই দেখেছ আমি বাড়ীতে নেই অমনই শুরু করেছ এই সব। চিরকেলে অভ্যাস যাবে কোথা!''[৫]

তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি বুদ্ধির দীপ্তিতে, দৃঢ়তায়, সাহসিকতায়, আধুনিক মনস্কতায় ভাস্বর। একজন নারীবাদী সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন নারীদের যে চিত্র তিনি অঙ্কণ করেছেন তার গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উভয় লেখিকাই তাঁদের ছোটগল্পে নারীদের স্বাধীনতা, পুরুষের সম-অধিকারপ্রাপ্তি, পণপ্রথা, পরিবারে পুত্র-কন্যার মধ্যে বৈষম্য, পুরুষদের কাছে নারীদের লাঞ্ছনার নানান কাহিনি তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে এই দুই লেখিকা কোথাও যেন একসাথে মিলে যান। তবে জ্যোতির্ময়ী দেবী যেমন প্রায় সর্বভারতীয় নারীচরিত্রের স্বরূপ আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন তাঁর গল্পে, অপরদিকে আশালতা দেবী শুধু বাংলা ও বিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন নিজেকে। ভাগলপুরে দীর্ঘকাল বাস করার ফলে সেখানকার মানুষজনের সাথে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ভালোভাবেই। তাঁর অনেক গল্পেই ভাগলপুর ও তার আশপাশের মানুষজনের জীবনকাহিনি উঠে আসতে দেখা যায়। কিছু কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য বাদ দিলে দুই লেখিকার লেখার কাঠামোটি মোটামুটি এক, তা হল নারীবাদী সাহিত্যভাবনা।

তথ্যসূত্র ঃ

১. গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত, অশোকা গুপ্ত ও মঞ্জুশ্রী সিংহ সহায়তায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা- সংকলন-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১১, পৃষ্ঠা–১৬৩-৬৪

২. ঐ, পৃষ্ঠা - ২০১

৩. গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত, অশোকা গুপ্ত, মঞ্জুশ্রী সিংহ ও অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় সহায়তায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা- সংকলন-৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা– ৩৩২

৪. আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন-২, ভূমিকা-তপোব্রত ঘোষ, সংকলন-অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, জুন,২০০৭, পৃষ্ঠা-১২১-২২

৫. দ্রষ্টব্য ঃ ঐ, পৃষ্ঠা - ৯৯

উপসংহার
UPASANHAR

নারীবাদী সাহিত্যিক হিসেবে জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশালতা সিংহ সমসাময়িক নারীদের কথা অত্যন্ত মমতার সাথে তুলে ধরেছেন। বর্তমান সমাজে নারীকে শুধুমাত্র নারীর পরিচয়ে না দেখে একজন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এই দুই লেখিকা। পুরুষ-প্রাধান্য থেকে বেরিয়ে নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক এই অভিপ্রায়ে এরা কলম ধরেছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর যে বিষয়টি উঠে আসে তাতে দেখা এই দুই শক্তিমতী সাহিত্যিক তাঁদের রচনার মাধ্যমে নারীবাদী চেতনার সুরটি উচ্চকিতে বেঁধে দিয়েছিলেন। আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগে তাঁরা যে সাহসী কাজটি করেছিলেন তার জন্য অনেক প্রশংসাই তাঁদের প্রাপ্য। নারীদের অন্তঃপুরে বন্দী না রেখে বাইরের জগতের সাথে তাদের পরিচিত করানোর কথা উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন তাঁরা। নারী স্বাধীনতা, তাদের অধিকার, সমাজে পুত্র-কন্যার মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন এই দুই লেখিকা। জ্যোতির্ময়ী দেবী সমাজ সচেতন লেখিকা ছিলেন। সমাজে পুত্র-কন্যার মধ্যে বৈষম্যের দিকটি তিনি ভালোভাবে মেনে নিতে পারেন নি। আমাদের সমাজে পুত্রসন্তান হওয়ার কামনা প্রায় সকলেই করে। তিনি তাঁর 'পুত্রেষ্ঠি' ছোটগল্পে দেখিয়েছেন কোন এক নিঃসন্তান ভদ্রলোক পুত্রসন্তান লাভের জন্য যজ্ঞ করেন নামী সন্ন্যাসী দিয়ে। এই গল্পের কথকের মুখেও শোনা যায় সমাজে পুত্র-কন্যা বৈষম্যর রূপটি –

''পিসিমার বাড়িতে গণৎকার জ্যোতিষী সাধু-সন্ন্যাসীর যাওয়া-আসা, ভিতরে-বাইরে কথাবার্তা-আলোচনা – এত বিষয়সম্পত্তি কে খাবে, কার ভোগে লাগবে, মেয়ে মানে তো পাথরবাটি, মিথ্যে সন্তান। বাপ-পিতামহর জলপিণ্ড লোপ পাবে – এইসব।''১

জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো আশালতা দেবীও তাঁর অনেক গল্পে সমাজে পুত্র-কন্যার মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর এমন একটি সার্থক ছোটগল্প 'নারীর মূল্য'। গল্পটিতে দেখা যায় পুত্রসন্তান হওয়াতে একটি বাড়িতে ঘন ঘন শাঁখ বেজে ওঠে। পরপর কন্যাসন্তান হওয়াতে নীরজাকে শাশুড়ীর অনেক খোটা শুনতে হয়। সেই সাথে স্বামীর মুখভারের জ্বালাতে নীরজা বেচারা বাড়িতে চোরের মতো থাকত। তাই পুত্রসন্তান হওয়াতে বাড়িতে আনন্দের বাণ ডেকে যায়। কাঙালী-বিদায়, বামুনদের একখানা করে কাঁসার থালা, পেতলের ঘড়া ও একজোড়া করে কাপড় দান করা হচ্ছে। গুরু ঠাকুরকে একখানা গিণি দিয়ে গিন্নী প্রণাম করেন। খোকার ষষ্ঠীপূজার দিন দেবতা-বামুনের কাছে আরও দানধ্যান করা হবে। বাঙালি ঘরে ছেলেতে মেয়েতে এতই পার্থক্য! আকাশ পাতাল ব্যবধান। ছেলে হলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, কিন্তু মেয়ে জন্মালে মা নিজেকে অপরাধী মনে করেন। এই গল্পে গৃহিণীর মতে–

''মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরে মেয়ে হলে সে যেন কী একটা বিষাদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বছর দেড়েক আগেকার কথা মনে পড়ছে আমার– ঐ নীরজারই তৃতীয় মেয়েটি যখন হয়। দাই বললে তাকে, কেমন গোলাপফুলের মতো ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে, একবার চোখ মেলে দেখ বৌমা। কিন্তু নীরজা সেই যে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল, কিছুতেই এদিকে মুখ ফেরালে না। .... একবার অনুরোধ করলাম তাকে, পাশ ফেরনা ভাই। তোর মেয়েকে যে পিঠ দিয়ে চাপা দিচ্ছিস। কান্নাভরা সুরে নীরজা বললে– পেটেই লাগুক আর পাটই লাগুক মেয়ের মুখ যেন আমাকে দেখতে না-হয় এই আশীর্ব্বাদ করো দিদি। কত দুঃখে যে বেচারা সে প্রার্থনা জানিয়েছে তা বুঝতে পেরে আমি চুপ করে রইলাম।''২

যুগের পরিবর্তনে নারীরা আজকে আর ঘরে বসে বন্দিনী জীবন অতিবাহিত করেনা, তারা এখন অনেক বেশি স্বাবলম্বী। কিন্তু তৎকালীন সমাজে নারী যে সত্যিই অবরোধ-বাসিনী ছিল তা আমরা জানতে পারি এই দুই লেখিকার শক্তিশালী কলমের জোরে। তাঁদের এই কর্মের জন্য তাঁরা যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন ঠিক তেমনি সমালোচনাতেও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। এঁদের এই দেখানো পথ ধরেই পরবর্তীকালে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন অনেক শক্তিমতী মহিলা সাহিত্যিক। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেবসেন, কবিতা সিংহ প্রমুখ সাহিত্যিক বাংলাসাহিত্যের ধ্বজাটিকে ক্রমশঃ উপরে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত, অশোকা গুপ্ত, মঞ্জুশ্রী সিংহ ও অঞ্জলী চট্টোপাধ্যায় সহায়তায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন– ৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা–৪০৫-৪০৬

২. ভূমিকা-তপোব্রত ঘোষ, সম্পাদনা: অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন-২, দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, জুন, ২০০৭, পৃষ্ঠা - ২৬২

আকর গ্রন্থপঞ্জি

১। সুবীর রায়চৌধুরী ও অভিজিৎ সেন সম্পাদিত: জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০১১

২। গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত ও সহায়তায় অশোকা গুপ্ত ও মঞ্জুশ্রী সিংহ: জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১১

৩। গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত ও সহায়তায় অশোকা গুপ্ত ও মঞ্জুশ্রী সিংহ, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়: জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৪

৪। গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত ও সহায়তায় অশোকা গুপ্ত, মঞ্জুশ্রী সিংহ ও অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়: জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৪

৫। গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত ও সহায়তায় অশোকা গুপ্ত, মঞ্জুশ্রী সিংহ ও অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়: জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১১

৬। ভূমিকা– তপোব্রত ঘোষ, সংকলন-অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী: আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা এবং স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০০৬

৭। ভূমিকা– তপোব্রত ঘোষ, সংকলন-অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী: আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা এবং স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০০৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। অনামিকা চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময়ী দেবী জীবন ও সাহিত্যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৮, বর্তমান সংস্করণ-২০১৮

২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ– ১৯৬৬, বর্তমান সংকলন- ২০১৯

৩। জয়ন্তী সাহা (রায়), সহ সম্পাদনা– তিস্তা দত্ত রায়, কৌশিক দাশগুপ্ত, যোধন প্রকাশনী, বর্ধমান, মে ২০১৩

৪। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: আমরা ও তাহারা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯

৫। নন্দদুলাল রায়: বিহারে বাংলা সাহিত্য, বিহার বাংলা আকাডেমি, পাটনা, প্রথম সংস্করণ-বৈশাখ ১৩৮৭, বর্তমান সংস্করণ-জানুয়ারি ১৯৮৯

৬। পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য: সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড: আধুনিক যুগ, গিরি প্রিন্ট সার্ভিস, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৯

৭। বেগম রোকেয়া: অবরোধ বাসিনী, প্রকাশক- বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, পি.ডি.এফফরম্যাট

৮। মৌ চক্রবর্তী, সোনা নয় রূপা নয় (জ্যোতির্ময়ী দেবী : সৃষ্টি ও মূল্যায়ন), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - ২০১২, বর্তমান সংস্করণ-২০১২

৯। রাসসুন্দরী দাসী: আমার জীবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮

১০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৮-২০১৯

১১। শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী: বাঙালী জীবনে রমনী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৪

১২। সম্পা সিন্হা: আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পের, আশাদীপ প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২

১৩। সুদক্ষিণা ঘোষ, কাহাকে- স্বর্ণকুমারী দেবী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন২০১৭